Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 209–218
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

ত্রিবেণী : স্বতন্ত্রধর্মী কৈবর্ত আখ্যান

সনুপ খাঁ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেল : sanupkhan123@gmail.com

Keyword
কৈবর্ত বিদ্রোহ, কৈবর্ত খণ্ড, উপন্যাসের, রামচরিত, মহাশ্বেতা দেবী, ত্রিবেণী।

Abstract
বাংলার প্রথম সার্থক বিদ্রোহ হিসাবে কৈবর্ত বিদ্রোহের সার্থকতা সম্পর্কে কমবেশি আমাদের সকলেরই জানা। সার্থক এই কারণে যে, বরেন্দ্রির মহা শক্তিশালী পাল রাজবংশের সঙ্গে যুদ্ধে একটা জনগোষ্ঠীর একতার জয় হয়েছিল। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যগ্রন্থ এই বিদ্রোহের একমাত্র প্রামাণ্য তথ্য জোগাতে সক্ষম। কিন্তু প্রত্নতত্ব, নৃতত্ব বলে কিছু জিনিস আছে, যেগুলোর সাহায্যে প্রাচীনকালের বিবিধ বস্তু, স্থান, ছবি, ভগ্নস্তুপ ইত্যাদি থেকে অনুমানলব্ধভাবে সত্যতার মুখোমুখি উপস্থিত হওয়া যায়।

কৈবর্ত বিদ্রোহ হয়েছিল, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কিন্তু সন্ধ্যাকর নন্দী বললেন কৈবর্ত বিপ্লব 'অনিকম ধর্ম্মবিপ্লবম্'। অর্থাৎ কৈবর্ত বিদ্রোহ অধর্মের সঙ্গে সংঘটিত হয়েছে। বেশ কয়েকজন পণ্ডিত, ঐতিহাসিক 'রামচরিত'এর ব্যাখাকে সাক্ষ্য মেনে এই তথ্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু ভীমের জাঙ্গাল, দিব্যকের গুহা এসবের ভগ্নপ্রায় রূপকে তথ্য হিসাবে জেনে দিব্যক, রুদোক, ভীম প্রমুখ চরিত্রের ও কৈবর্ত বিদ্রোহের এক অন্য ইতিহাস রচনা করলেন। আখ্যান বর্ণিত হল ইতিহাসের আদলে। চরিত্রের মধ্যে মিশে গেলো ইতিহাস ও ঔপন্যাসিকের কল্পনা।

মহাশ্বেতা দেবীর 'কৈবর্ত খণ্ড', অনুরূপা দেবীর 'ত্রিবেণী', সত্যেন সেনের 'বিদ্রোহী কৈবর্ত', হরিশংকর জলদাসের 'মোহনা', জাকির তালুকদারের 'পিতৃগণ' ইত্যাদি উপন্যাসে ঔপন্যাসিকরা তাদের নিজস্ব রীতিতে কৈবর্ত কাহিনিকে সাজিয়েছেন। প্রতিটি উপন্যাসেই কৈবর্ত বিদ্রোহের পাশাপাশি বরেন্দ্রীর কৈবর্তদের স্বতন্ত্রধর্মী জীবনাচরণের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। রয়েছে পাল রাজা দ্বিতীয় মহীপালের রাজ্যশাসনের সময়কার ছবি। প্রজাশাসনে বিশেষ করে কৈবর্ত জনগোষ্ঠীর প্রতি মহীপালের অরাজকতা, অনৈতিকতার দৃশ্যএর কথা কেউই বাদ দেননি।

একাধারে দিব্যক, ভীম, রুদোক ইত্যাদি চরিত্রের বর্ণনা, বিদ্রোহে মহীপাল হত্যা, রামপালের পলায়ন ইত্যাদি, অপরদিকে মহীপালের ভাই রামপালের রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য কঠোর সংগ্রাম ও অবশেষে ভীমের শাসন থেকে রাজ্য পুনরুদ্ধারের ছবি উপন্যাসগুলিতে ইতিহাসের মত করে পরিবেশিত হয়েছে।

আমার আলোচ্য প্রবন্ধে এই কৈবর্ত কাহিনিমূলক উপন্যাসের মধ্যে থেকে শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'ত্রিবেণী' উপন্যাসে বর্ণিত কৈবর্ত বিদ্রোহের পটভূমি, উপস্থিত বিদ্রোহকাল ও বিদ্রোহ পরবর্তী সময় এবং সর্বোপরী রাজ্য পুণরুদ্ধারের

পর ভীমের সঙ্গে রামপালের আন্তরিক হৃদয়বৃত্তজনিত সন্ধি বৃত্তান্ত আলোচনা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে কৈবর্ত কাহিনি মূলক অন্যান্য উপন্যাসের সঙ্গে এর স্বতন্ত্রতা দেখানো হয়েছে।

Discussion

কৈবর্ত বিদ্রোহ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে গ্রন্থের সংখ্যা খুব একটা বেশি না হলেও সময়ান্তরে বেশ কয়েকজন ঔপন্যাসিক তাঁদের আখ্যান সংগ্রহ করতে গিয়ে তৎকালীন বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের প্রথম সফল বিদ্রোহের নথির প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। যদিও এ বিদ্রোহের প্রামাণিক তথ্যের বিষয়ে আগেই বলা হয়েছে। সুতরাং উপন্যাস কৈবর্ত বিদ্রোহকে কতটা বাস্তবতা দিতে পেরেছে এবং এর সাহিত্যিক মানদণ্ড ঠিক কতটা সে বিষয়েই আলোকপাত করবো।

অনুরূপা দেবীর 'ত্রিবেণী' উপন্যাসের বর্ণনানুসারে কৈবর্ত বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট ও অন্যান্য কৈবর্ত বিদ্রোহ মূলক আখ্যাঙ্গুলর সঙ্গে এ উপন্যাসের স্বতন্ত্রতা খুঁজে দেখবো। উপন্যাস শুরুর আগে ভূমিকা অংশে ঔপন্যাসিক শ্রীমতী অনুরুপা দেবী পাল সাম্রাজ্যের বংশজ ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। ভূমিকালোচনা অনুসারে গরুরস্তম্ভ লিপি থেকে জানা যায় পাল রাজাদের মন্ত্রীপদ বংশানুক্রমিক ছিল এবং বর্ণাশ্রম বিভাজন অনুসারে তাঁরা ব্রাহ্মণবংশী ছিলেন। উপন্যাসের ভূমিকা অংশে মন্ত্রী পরিচয়ের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তা নিম্নে দেওয়া হল-

> "শ্রীবামনভট্ট মহীপালের মন্ত্রী (বানগড়লিপি, ২০শ শ্লোক) ছিলেন। ৩য় বিগ্রহপালের পুত্র রামপালের মন্ত্রী ছিলেন যোগদেবের পুত্র বোধিদেব (৫ম শ্লোক)। বৈদদেবের (কামরূপরাজ) কমৌলী লিপি থেকে ৩য় বিগ্রহ পালের মন্ত্রীর নাম জানা যায়। বৈদদেবের পিতামহ যোগদেব বংশক্রমে বিগ্রহপালের মন্ত্রী হইয়াছিলেন বলিয়া উহাতে উল্লেখ করিয়াছিলেন।"[১]

আলোচ্য তথ্যগুলোর মাধ্যমে পালরাজাদের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য উপন্যাসে বর্ণিত বিভিন্ন পারিষদবর্গের বিবিধ ভূমিকাগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সহজ হয়ে ওঠে। পারিষদবর্গদের ভূমিকা এখানে বানগড়লিপির অনুকরণেই করা হয়েছে।

উপন্যাসের আখ্যান বর্ণনার প্রারম্ভে ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে বর্ণিত কৈবর্তজনগোষ্ঠীকে তাদের দু'টো শাখার (জালিক ও হালিক) প্রথম পর্যায়ের বলে অভিহিত করেছেন। অথচ সত্যেন সেন, মহাশ্বেতা দেবী, জাকির তালুকদার, হরিশংকর জলদাস বিদ্রোহী কৈবর্তদের হালিক শ্রেণিভুক্ত করে দেখিয়েছেন। 'ত্রিবেণী'র কৈবর্তদের সম্পর্কে লেখিকার অভিমত নিম্নে দেওয়া হল—

> "মাসিক বসুমতীতে প্রকাশকালে আমার এই উপন্যাসে দিব্যোক ও ভীম প্রভৃতিকে "জালিক" কৈবর্ত্তরূপে অঙ্কিত করায় কয়েকজন মাহিষ্য পাঠক ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন,"[২]

প্রতিবাদের কারণ এখানে আলোচ্য বিষয় নয়, শুধুমাত্র কৈবর্ত বিদ্রোহ কেন্দ্র করে লেখা প্রমুখ ঔপন্যাসিকের আখ্যানে কৈবর্তদের হালিকরূপে সূচিত করার বিপরীতে অনুরূপা দেবী তাঁর উপন্যাসে কৈবর্তদের জালিক পর্যায়ভুক্ত করেছেন তা প্রকাশ করা হয়েছে। বরেন্দ্রি বিদ্রোহের কৈবর্তরা যে হালিক শ্রেণির নয়, তারা যে জালিক এ বিষয়ে অনুরূপা দেবী তাঁর যুক্তিপূর্ণ মতামত দিয়েছেন উপন্যাসের ভূমিকা অংশে –

> "নদীমাতৃক বঙ্গদেশে বাস নিবন্ধন পালরাজাদের সৈন্যবলের মধ্যে যে নৌবল যে প্রধান বল ছিল, বহুতর তাম্রশাসন হইতে তাহা প্রমানিত হইয়া থাকে। এই নৌবাহিনী কাহাদের দ্বারা পরিচালিত হইত, যদিও ইহার কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ পালশাসনাদি হইতে পাওয়া যায় নাই, তথাপি প্রাচীন ভারতে বহুকাল হইতেই নৌযুদ্ধের অধিনায়ক সৈন্যদল যে কৈবর্ত্ত জাতীর হইত, তাঁহার বিশেষ প্রমাণ রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ৮৪ অধ্যায়ের এই শ্লোক হইতে—
> 'নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্ত্তানাং শতম্ শতম্।
> সন্নদ্ধানাং তথা যুনান্তিষ্ঠন্ত্বিভ্যচোদয়ৎ'।।"[৩]
>
> "রামায়ণের দ্বিতীয় কাণ্ডের ৮৪ সর্গে রামের অনুসরণে যখন ভরত চিত্রকূট গমন করেন, সেই সময়ে তিনি নিষাদরাজ্যে আগমন করিলে, গুহ তাঁহার দূরভিসন্ধি সন্দেহ করিয়া গমনে বাধা দিবার নিমিত্ত অন্যান্য সৈন্য সমাবেশের আজ্ঞা দিয়া কহিতেছেন।"[৪]

উপন্যাসের ভূমিকা অংশে উক্ত শ্লোক দ্রষ্টব্য। ঔপন্যাসিক যদিও তাঁর আখ্যানের কৈবর্তদের জালিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকৃতি দিলেও, তাদের বৃত্তি যে কৃষিকাজ তা আখ্যানের মধ্যে দিয়েই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

জলজীবী মানুষের কৃষকবৃত্তির দৃষ্টান্ত বরেন্দ্রি অঞ্চলের কৈবর্তদের মধ্যেই প্রাথমিকভাবে জানতে পারা যায়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন উপন্যাসে যেমন, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম', হরিশংকর জলদাসের 'দহনকাল' ইত্যাদি উপন্যাসে দেখি জেলে, ধীবর, মালোদের বৃত্তি পরিবর্তন হতে। শুধুমাত্র স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য জালিকদের এই বৃত্তি পরিবর্তন পাল আমলের শাসকবর্গের রক্তচক্ষু এড়িয়ে যায়নি। কৈবর্তরা যে স্বাধীনচেতা জাতি তা প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন গ্রন্থাদি থেকে প্রমাণিত। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে উল্লেখ রয়েছে যে ময়ুরধ্বজ ও শিরধ্বজ ছিলেন কৈবর্ত রাজা। হরিবংশে দেখি শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয়া শ্রুতদেবীর সঙ্গে কৈবর্ত রাজার বিয়ে হয়। মহাভারতের মৎস্যগন্ধা উপাখ্যানের কথা আমরা প্রায় সকলেই জানি। অর্থাৎ কৈবর্তদের যে একটা পৃথক সত্তা বজায় ছিল তা তাদের রাজা, রাজ্যশাসন ইত্যাদি এইসব থেকে খুব সহজেই অনুমান করা যায়। ক্ষত্রিয় সুলভ তাদের আচরণ। ঔপন্যাসিক এই কারণেই বরেন্দ্রির কৈবর্তদের হালিক না বলে জালিক আখ্যা দিয়েছেন। সময়, স্থান ও জীবিকা নির্বাহের সুবিধার্থে বরেন্দ্রীর বন-জঙ্গল, জলাভূমি, কৃষিজমির ওপর তাদের একচ্ছত্র অধিকার। জীবিকা নির্বাহের উপযুক্ত সংস্থান না হওয়াই, বরেন্দ্রীর কৈবর্তরা কৃষিকাজকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র ধ্যান বলে মনে করেছিল।

আধুনিকলের একজন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক অভিজিৎ সেন রচিত 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে বাজীকর জনগোষ্ঠীর জীবনকড়চা এঁকেছেন। উপন্যাসে বাজিকরকে যাযাবর জনজাতি বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের কোনো স্থায়ী বসতি নেই। গোষ্ঠীবদ্ধভাবে তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ী বসতি গড়ে তোলে। তাদের নিজস্ব ভিটেমাটি নেই, নেই চাষের জমি, পশুপালন ও পশু কেনাবেচা তাদের রক্তে। সেইসঙ্গে বিভিন্ন ভেলকিমূলক খেলা দেখিয়ে তাদের জীবিকা সংস্থান। অভিজিৎ সেন বাজীকর জনজাতির মানুষের সঙ্গে যদিও হালিক বা জালিক কৈবর্ত নির্ধারণ উপন্যাসের মুখ্য বিষয় নয়। ইতিহাসের বিষয়কে সামনে রেখে পাল সম্রাট দ্বিতীয় মহীপাল ও তাঁর পরবর্তী সময়কাল সর্বোপরি বরেন্দ্রি অঞ্চলের কৈবর্তদের বিদ্রোহীসত্তা ও পাল সাম্রাজ্য দখল ও পতন এ উপন্যাসের উপজীব্য। ইতিহাস যেখানে সত্য উদঘাটনে কুণ্ঠিত, সাহিত্য সেখানে স্বল্প প্রামাণ্য তথ্যকে নির্ভর করে আপন যুক্তি ও অনুমানদ্রষ্ট আখ্যান নিয়ে উপস্থিত।

কৈবর্ত বিদ্রোহকে উপজীব্য করে অনুরূপা দেবী থেকে শুরু করে সত্যেন সেন, মহাশ্বেতা দেবী, হরিশংকর জলদাস, জাকির তালুকদার, অমরজ্যতি মুখোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিকেরা তাঁদের স্বঅর্জিত তথ্যকে নির্ভর করে স্বকল্পিত নানা ছাঁদের কাহিনির অবতারনা করেছেন। কাহিনির দিক থেকে প্রত্যেকটি উপন্যাসের মধ্যে স্বতন্ত্রতা রয়েছে। তবে সন্ধ্যাকর নন্দী দিব্যককে উপধিব্রতী ও কৈবর্ত বিদ্রোহকে 'অনিকম্ ধর্মবিপ্লবম্' বলে অভিহিত করলেও ঔপন্যাসিকরা তাঁদের আখ্যানে তা দেখালেন না। তাঁরা স্বাধীনচেতা এই জাতিটির বিদ্রোহমুখীন হয়ে ওঠার যথার্থ কারণ দেখালেন।

'ত্রিবেণী' উপন্যাসে ভীমকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ করে দেখানো হয়েছে। প্রবল শক্তিশালী যুবক এই ভীম। তার পরিবার, প্রতিবেশী, গ্রাম সকলের কাছেই সে সমাদৃত ও সম্মানীয়। সম্মানীয় হওয়ার পিছনে যদিও আরও একটা কারণ দেখি, সেটা হলো, তার জ্যাঠা দিব্যক ছিলেন পাল সাম্রাজ্যের পূর্বতন কর্মচারী। বর্তমানে সে বৃদ্ধ কৈবর্ত। কিন্তু পাল সাম্রাজ্যের একজন অধিকর্তা হওয়ার কারণে কৈবর্তগোষ্ঠী তাকে তাদের প্রধান বা রাজার সম্মানে অধিষ্ঠিত করেছিল। কৈবর্তদের সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে তারা স্বাধীনচেতা জাতি। তারা নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে থেকেই রাজা বা দলপতি নির্বাচনে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। সেই থেকেই দিব্যকের বংশ কৈবর্তদের কাছে একপ্রকার রাজবংশ।

যদিও দিব্যকের পরিবারের এই সম্মান প্রাপ্যের আরও একটা কারণ উপন্যাসের মধ্যে জানা যায়–

> "দিব্যোকের পিতা পুণ্যক দেশের জন্য নিজের প্রাণ এবং সমস্ত ধনজন, এমনকি, জীবনধারণের একমাত্র উপায়ন্তরুপ শস্য ক্ষেত্রগুলি পর্য্যন্ত সমস্তই আনন্দের সহিত রাজার কার্য্যে সঁপিয়া দিয়া দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন।"[৫]

কিন্তু প্রশ্ন আসে মহাশক্তিশালী পাল সাম্রাজ্যের মধ্যে সামান্য একজন জেলের ছেলে এতোবড় আত্মত্যাগের সুযোগ পেলেন কি করে? এ প্রসঙ্গে উপন্যাসের ভূমিকা অংশে ঔপন্যাসিকের মন্তব্যের কথা আবারও স্মরণ করতে হয়। অর্থাৎ বরেন্দ্রির কৈবর্তরা জাতিতে জেলে। জল, নৌকো, মাছের জাল এসবের সঙ্গে তাদের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। জল ও জলযানে তাদের মতো

পারদর্শী জাতি আর নেই। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে পাল সাম্রাজ্যের একটা অতিরিক্ত ও প্রবল শক্তির জায়গা যে তৈরি হয়ে গিয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। খুব স্বাবাবিকভাবেই পাল সৈন্যদলের মধ্যে কোটিবর্ষের কৈবর্তদের আহ্বান জানানো হয়েছিল।

এখানে আবারও প্রশ্নের উদ্রেক হয়। সদা শান্তিপ্রিয় নিজেদের গণ্ডির মধ্যে সহজ-সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত কৈবর্তরা কেন পাল সাম্রাজ্যের হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে যাবে! এখানে একটা বিষয় পরিস্কার যে কৈবর্তদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত ছিল। হয়তো গৌড়রাজ্যের অধীনে থেকেও তারা নিজেদের জন্য পৃথক শাসন দাবী করেছিল। তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে তথাকথিত কোনরকম উচ্চবর্গের পায়ের ছাপ যেন না পরে এই দাবী তাদের ছিল। তৎকালীন নিয়ম অনুযায়ী উৎপাদিত ফসলের এক ষষ্ঠমাংশ রাজার কাছে প্রেরণেও তারা সম্মত ছিল। আবার পৃথিবীর বিবিধ প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন জল, জঙ্গল, ভূমি এসবে তারা রাজার হস্তক্ষেপ চায়নি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও দেশের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্বের নিষ্ঠাতেই তারা গৌড়ের হয়ে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে এক হয়ে যুদ্ধ লড়তে পেরেছে। দেশ ও রাজার প্রতি প্রেম ও ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ পুণ্যকের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তের কথা আগেই বলা হয়েছে।

শুধুমাত্র পুণ্যকই নয়, সমগ্র কৈবর্ত জাতি গৌড়ের নৌ-সেনার ভার নিতে পিছপা হয়নি। কিন্তু এরই মধ্যে দিব্যকের পরিবার যথার্থ সম্মানের দাবী রাখে বলে মনে হয়। উপন্যাসের 'ভীম' নামক দ্বিতীয় অংশে ভীমের অপহরিত স্ত্রী উজ্জ্বলাকে ফিরে পাওয়ার জন্য ন্যায় বিচার চাইতে গিয়ে সত্তর বছরের বৃদ্ধ দিব্যকের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা ঘটনা এবং দ্বিতীয় মহীপাল কর্তৃক সেই ঘটনার স্বীকারোক্তি এই সম্মানের প্রামাণ্য তথ্য।–

দিব্যকের যৌবনকালে দ্বিতীয় মহিপালের পিতামহ নয়পালের রাজত্বের শেষ সময়ে চেদিরাজ কর্ণের সঙ্গে বরেন্দ্রভূমির প্রবল যুদ্ধ হয়। সেসময় গৌড়ের রাজকোষ টান পড়া থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ, খাদ্যাভাব ইত্যাদি কারণে বরেন্দ্রভূমির তখন বিধ্বস্তপ্রায় অবস্থা। শত্রু যখন দ্বারে আগতপ্রায় তখন কোটিবর্ষের বন্য, কালো মানুষগুলো তাদের ধন-জন-প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আত্মনিয়োগ করে পালসাম্রাজ্যের সম্মান রক্ষা করেছিল। চরম দুর্দিনে সাহায্যের জন্য দেওয়া কোনোকিছুই তারা পুনরায় ফিরে না পেলেও তার দাবিদার হয়ে পাল সম্রাটের কাছে ধর্না দেয়নি। পক্ষান্তরে পরবর্তীকালে দিব্যক দেশের স্বার্থে রাজরক্ষীপদে আসীন হয়ে সম্রাটের তথা পাল সাম্রাজ্যের কাছে নিজেকে নিয়োজিত করে। জানা যায়, বিগ্রহপালের রাজ্যারোহণের পর পুনরায় চেদিপক্ষ পাল সাম্রাজ্য আক্রমণ করলে বর্ম্মারাজ চেদিপক্ষে যোগদান করে, এমত অবস্থায় প্রবল শক্তিশালী চেদিসম্রাটের শক্তিক্ষয়হেতু বর্ম্মারাজকে বন্দী করে দিব্যক। যদিও পরবর্তীকালে রাজা ভৃত্য মনমালিন্যের কারণে দিব্যককে রাজপ্রাসাদ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কৈবর্তপল্লীতে তার সম্মান ক্রমশ বেড়ে ওঠে বংশপরম্পরায়। দিব্যক থেকে রুদোক, রুদোকের পুত্র ভীম, প্রত্যেককে কোটিবর্ষের মানুষ সম্মান করে।

উপন্যাসে রাজধানীর একপ্রান্তে অবস্থিত কৈবর্তপল্লীর কুটিরগুলোকে, বিশেষত দিব্যক, রুদোক কৈবর্তদের কুটিরগুলোকে দারিদ্রব্যঞ্জক করে দেখানো হয়নি, বরং স্বচ্ছল গৃহস্থের পরিচয়কেই তুলে ধরা হয়েছে–

> "মধ্যে একখানি আটচালা, ইহার একধারে কয়েকখানা সুন্দরভাবে মার্জিত সুসংবদ্ধভাবে অবস্থিত গৃহ এবং অপরপার্শ্বে সারিসারি গলা মড়াই, ঢেঁকিশালা ও গো-গৃহ। পশ্চাতে ও পার্শ্বে সুবিস্তৃত বাগান এবং একটি পুস্করিনী। তদ্ভিন্ন অনেক বিঘা ধান জমীও তাহাঁদের আছে। মোটের ওপর ইহাদের অবস্থা আগের চেয়ে অনেকখানি খাটো হইয়া গেলেও এখনও যথেষ্ট স্বচ্ছল বলা চলে।"[৬]

উদ্ধৃতাংশ থেকে আরও একটা বিষয় পরিস্কার যে, কৈবর্তদের পূর্ব অবস্থা অনেক বেশী স্বচ্ছল ছিল। অর্থাৎ অগ্রজ পাল রাজাদের সময়ে কৈবর্তপল্লী একপ্রকার তথাকথিত উচ্চবিত্ত গৃহস্ত পরিবারের মতোই ছিল। সত্যেন সেনের 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' উপন্যাসের বর্ণনা অনুযায়ী, ধর্মপালের সঙ্গে কৈবর্তদের একপ্রকার সন্ধি হয়েছিল, শর্ত অনুযায়ী কৈবর্তপল্লী অঞ্চলের ভূমির ওপর রাজা হাত দেবে না। কিন্তু সে শর্তের লিখিত খসড়া পাল রাজাদের কাছে থাকলেও কৈবর্তরা মুখের কথাকেই বেদবাক্য মনে করে তার কোনো লিখিত খসড়া নিজেদের কাছে রাখেনি। তাদের এই সহজ সরল মানসিকতার মূল্য পরবর্তীকালে তাদেরকে দিতে হয়েছিল কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে।

দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে যখন রাজকোষে টান পড়তে শুরু করে অধিক বিলাসিতার কারণে, তখন বরাহস্বামীর নজরে পড়ে কৈবর্তপল্লীর জমিজমা, ফসল ইত্যাদির ওপর। রাজপুরুষবর্গ ধর্মপালের সময়কালের শর্তের কথা মনে রাখলেও,

তাদের ধূর্ত মানসিকতা এও স্মরণে নিয়ে আসে যে সহজ-সরল কৈবর্তজাতি শর্তের কোনো লিখিত রূপ তাদের কাছে রাখেনি। সুতরাং বসিয়ে দিলেন কৈবর্ত সম্পদ বলে এতদিন যা পরিচিত ছিল, সেসবের ওপর রাজকর। জল, মাছ, ভূমি এসবের ওপর কর দেওয়াতে অভ্যস্ত ছিল কোটিবর্ষের প্রজারা। দীর্ঘদিন ধরে এই করের বোঝা কৈবর্ত পল্লীর অর্থ ও গৃহের শ্রী ও সৌষম্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রবল দৈহিক পরিশ্রমে অর্জিত সম্পদের ওপর রাজকোষের শনিদৃষ্টি বর্ষিত হয়।

'ত্রিবেণী'তে দেখি পারিবারিক অবস্থা আগের তুলনায় অস্বচ্ছল হলেও জীবন ও জীবিকার জন্য সংগ্রামে কৈবর্তরা বিন্দুমাত্র ভীত নয়। পরিবারে পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে ভীমের স্ত্রী উজ্জ্বলার মতো কর্মময়ী নারীদের জীবন ও জীবিকার জন্য সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ আর্থিক দুর্বলতাকে জয় করতে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম না হলেও মোটের ওপর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ঘরোয়া কোন্দল সবকিছু নিয়ে বলা যায় একপ্রকার শান্তির জীবন যাপনের চিত্র কৈবর্তপল্লীর মধ্যে পাওয়াই যায়।

কৃষিকাজের পাশাপাশি মল্লক্রীড়া, অস্ত্রশিক্ষার নিদর্শন ভীম ও তার বন্ধু হরি কৈবর্ত হতে পাওয়া যায়। খুব সহজভাবেই বোঝা যায়, কৈবর্তরা যুদ্ধপ্রিয় জাতি। রাজার জন্য যুদ্ধ করতে হলে অস্ত্রশিক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু রাজ অনৈতিকতা যখন চরমে তখন অস্ত্রশিক্ষার হেতু হয়ে যায় ভিন্ন। অথচ রাজার কাছে খবর যায়, কৈবর্তপল্লীতে রাজসৈন্যকে শক্তিশালী করবার জন্যই নিয়মিত প্রস্তুতি চলছে। অস্ত্রশিক্ষায় বিন্দুমাত্র খামতি দেওয়া যাবে না, দলের মাথা ভীমের নির্দেশ। প্রশ্ন জাগতে পারে, রাজার তরফ থেকে যুদ্ধের আশঙ্কার কথা ঘোষণা না করলেও, নিয়মিত অস্ত্রশিক্ষা কিসের প্রয়োজনে। এর দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যা অনেক পরে লিখেছেন, তা বহুপূর্বেই কৈবর্ত জনজাতি বিশেষত ভীম কৈবর্তের বুদ্ধিদীপ্ত মানসিকতার পরিচায়ক ছিল। ভীম কৈবর্তের সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকার পরামর্শের কথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শেষের কবিতা'য় দিলেন এভাবে—

> "সম্ভবপরের জন্যে সব সময়েই প্রস্তুত থাকাই সভ্যতা; বর্বরতা পৃথিবীতে সকল বিষয়েই অপ্রস্তুত।"[৭]

পাল সম্রাট ও রাজন্যবর্গ যেখানে কৈবর্তদের ক্ষুদ্র ভেবে অবহেলা করে এসেছে বরাবর, তাদের শক্তি সম্পর্কে সর্বদা থেকেছে উদাসীন, সেদিক থেকে ভীমের চিন্তাধারা বলে দিচ্ছে কৈবর্তরা পাল রাজন্যবর্গ হতে যথার্থ আধুনিক চিন্তাধারার মানুষ।

কৃষকের ফসল অপহরণ, রাজসৈন্য কর্তৃক খোলা বাজার থেকে যুবতি মেয়ে অপহরণ, ধর্ষণ, খুন, প্রতিবাদের ফল সমগ্র গ্রামে অগ্নিকাণ্ড এসব তো চলে আসছিল। কিন্তু এর প্রভাব যে কৈবর্ত জনজাতির মধ্যে প্রবলভাবে পড়তে পারে সে বিষয়ে পাল রাজন্যবর্গকে একেবারেই উদাসীন থাকতে দেখা যায় এ উপন্যাসে। সেইকারণেই রাজকর্মচারীদের তরফ থেকে অত্যাচারের মাত্রা ক্রমে বাড়তে থাকে। কিন্তু অপরাধ সীমা অতিক্রম করে উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশ 'ভীম' এর প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত মল্লক্রীড়ার দিন মহাপ্রতীহার কর্তৃক ছলনার আশ্রয়ে ভীমের স্ত্রী উজ্জ্বলাকে অপহরণের ঘটনার মধ্যে দিয়ে। ক্রীড়াঙ্গনে গ্রামের সকলে উপস্থিত থাকলেও অপহরণের ঘটনা ভীমের বন্ধু হরির চোখকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। প্রজ্জ্বলিত হয় কৈবর্তপল্লীর জনমানসের মধ্যে অন্তর্দাহ ও পাল রাজার বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভ।

বিদ্রোহের যদি সংজ্ঞা করা হয়, তাহলে বলতে হয়- সাধারণত সরকার বা স্থানীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের অসন্তোষ অর্থাৎ শাসকের বা সরকারের স্বৈরাচারী শাসনের অথবা অত্যাচারের বিরুদ্ধে পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশকে বিদ্রোহ বলা যায়। তবে এটা সংঘটনের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে। শাসকের অনৈতিকতা, অরাজকতা, অত্যাচার যখন চরমে ওঠে তখন প্রজা বা সাধারণ মানুষ অথবা কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী তাদের উপযুক্ত দাবি ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য বিদ্রোহ করে বসে। উপন্যাসে বিদ্রোহের পটভূমিটা যদি পরপর সাজানো হয় তাহলেই বুঝতে পারা যাবে কোটিবর্ষের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষগুলোর পাল রাজধানীতে আক্রমণ ও দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করার কারণ ও তার পেছনে স্বার্থ কিছু ছিল কি না।

প্রথমত— কৈবর্তপল্লীর জমিজিরাত, উৎপাদিত ফসলে বেহিসাবী কর আদায়।

দ্বিতীয়ত— কৃষকের ফসল কেড়ে নেওয়া।

তৃতীয়ত— রাজকর্মচারী কর্তৃক কৈবর্ত নারী অপহরণ ও ধর্ষণ।

চতুর্থত— প্রতিবাদ করতে গেলে গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া।

পঞ্চমত— সন্ধ্যার আঁধারে গ্রাম্য হাস্যোচ্ছল কর্মময়ী ভীম কৈবর্তের স্ত্রীর প্রতি মহীপালের কুদৃষ্টি।

ষষ্ঠত— ভীম কৈবর্তের স্ত্রী অপহরণ।

সপ্তম— পাল রাজন্যবর্গদের গৃহযুদ্ধ।

ভীমের পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে। দিব্যক তথা ভীমের জ্যাঠামশাই রাজ দরবারের বৃদ্ধ কর্মচারী। অপহরণের সংবাদে দিব্যক কর্তৃক রাজার কাছে ন্যায় বিচার চাওয়ার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। কিন্তু নারী মাংসে বিভোর মহীপাল তাতে কর্ণপাত না করলে দীর্ঘকালীন পাল রাজ্যের জন্য নিজেকে নিয়োজিত দিব্যকের মনে ক্ষোভ জন্মায়। ক্ষোভবশত মহীপালের সভাতেই প্রকাশ্যে মহাপ্রতীহারকে অপহরণকারী বলে উল্লেখ করার দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে একপ্রকার।

উপন্যাসে দিব্যকের দোষারোপের প্রমাণ চেয়ে মহীপাল কর্তৃক দিব্যককে যে উপদেশ দান ও উজ্জ্বলার প্রতি যে মন্তব্য করা হয়েছে, কৈবর্ত জনগোষ্ঠীর রক্তে উন্মাদনা জাগানোর জন্য তা যথেষ্ট–

> "কিন্তু দূতী ও পাল্কী পাঠিয়ে কেউ কখনো কারুকে চুরী করে না, তবে এ হ'তে পারে যে, পূর্ব্ব হতে তাদের মধ্যে সঙ্কেত ছিল, তাই দূতী ও পাল্কী পাঠিয়ে দিতেই উজ্জ্বলা স্বেচ্ছায় সেখানে চলে গেছে।"[৮]

মহীপাল তাঁর কুযুক্তিকে তীক্ষ্ণ করতে আরও বলেন—

> "যদি তিনি সতীরানীই হবেন, তা'হলে অনায়াসে পর পুরুষের পাঠানো পাল্কী চড়ে দূতীর সঙ্গে চলে গেলেন কি করে? এ ত সতী সাবিত্রীর কোন মতেই লক্ষণ নয়! তাই বলি কি, একটা অসতী স্ত্রীর জন্য বৃথা শোকে আচ্ছন্ন থেকে পৌরুষ নষ্ট না করে, ভীমকে বরং একটা কিছু কায নিয়ে কিছু দিন দেশান্তরে যাবার পরামর্শ দাও গে যাও, তারপর একটা সুন্দরী দেখে বড়সড় মেয়ে এনে তার বিয়ে দিয়ে দাও, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"[৯]

স্ত্রী অপহরণের বিষয়কে চাপা দেওয়ার সর্বত চেষ্টা করার পর মহীপাল কর্তৃক ভীমের প্রতি তথা তার পৌরুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চেষ্টা করতে। রাজা নিজে থেকে একজন তথাকথিত নিম্নবর্গ প্রজাতির মানুষকে মগধে দণ্ডপানিকের পদ দিচ্ছেন, আপাতভাবে তা সত্যিই মহানুভাবকের পরিচয়–

> "আপাততঃ মগধে ও কৌশিকী-কচ্ছে কতকগুলি লোক নিযুক্ত করতে হবে, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমি মগধে দণ্ডপানিকের পদ প্রদান ক'রে পাঠাতে প্রস্তুত আছি। এমন কি তাকে কৌশিকী-কচ্ছের মহাপ্রতীহারের পদ দেওয়াতেও আমার আপত্তি নেই।"[১০]

মহীপালের কথায় দিব্যক অসন্তুষ্ট হয়। কারণ, পুত্রবধূকে কুলত্যাগিনী বলে সে মেনে নিতে পারেনি। তাই বারবার একই অনুরোধ করলে রাজা বিরক্ত হয়ে তাড়িয়ে দেয় দিব্যককে। অর্থাৎ, দিব্যকের সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তিনি মহাপ্রতীহার রুদ্রদমনকে শাস্তি দিতে পারবেন না।

ঔপন্যাসিকের বর্ণনা থেকে পরিস্কার যে, দিব্যক এখানে 'উপধিব্রতী' নয়। কারণ, দিব্যক ন্যায় বিচার না পেয়ে প্রকাশ্যেই মন্তব্য করে—

> "আজ হতে চিরদিনের জন্য আপনার সিংহাসন তার অনেকগুলি বিশ্বস্ত ভৃত্য থেকে চির বঞ্চিত হলো! হয়তো একদিন এ ক্ষতিকে খুব সামান্য ব'লে মনে করতে পারবেন না, হয়তো এর জন্য আপনাকে অনুতাপও করতে হবে। আজ থেকে আপনি আমার এবং আমি আপনার মহাশত্রু।"[১১]

অতএব, অনুরূপা দেবীর বর্ণনায় কৈবর্ত বিদ্রোহ 'অনিকম ধর্মবিপ্লবম্' আর রইল না।

মহীপালের ভোগ বিলাস তথা নারী লোলুপতা যখন ভীমের স্ত্রী পর্যন্ত পৌঁছায় এবং ঘটনাক্রমে আত্মহননে সফল উজ্জ্বলার শেষ নিশ্বাস ত্যাগের অন্তিমকালে জানতে পারা যায় অপহরকারী স্বয়ং মহারাজের আদেশের স্বীকার, বিদ্রোহ অগ্নি তখন জ্বালামুখ থেকে নির্গত হয়ে গেছে। পরিণাম অপ্রস্তুত গৌড়ে দিব্যকের নেতৃত্বে ও ভীম ও তার বন্ধু হরির সেনাপতিত্বে ঝাঁকে ঝাঁকে কৈবর্ত সেনার আক্রমণ ও নির্দয় হত্যাকাণ্ড। সেইসঙ্গে ভীম কর্তৃক মহীপাল হত্যা।

'রামচরিত'কার সন্ধ্যাকর নন্দীকে সূত্র করে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভীম কর্তৃক দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা সহজ চোখে নেয়নি। ভীম কর্তৃক এহেন হত্যার পরিণামে ভীম কলঙ্কিত বলে পণ্ডিত মহলে আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর 'কৈবর্তখণ্ড' উপন্যাসের স্মরণ করা যেতে পারে—

"ভীমকে ভালো জেনেই তাকে কালিমালিপ্ত করবে। জানবে, এক অকলঙ্ক মানুষের নাম স্থায়ীভাবে কলঙ্কিত করে যাচ্ছ।"[১২]

মহীপাল হত্যার পরে পাল রাজভবন ও গৌড়ে কৈবর্তদের একচ্ছত্র অধিকার সূচিত হলেও রামপাল গৌড়ে কৈবর্ত শাসন মেনে নিতে পারেননি। যদিও ভাই হওয়া সত্ত্বেও সন্দেহের বশে তাঁকে ও শূরপালকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল দ্বিতীয় মহীপাল কর্তৃক। পাল সাম্রাজ্যের প্রজাবর্গও তাতে অসন্তুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে কারাগার থেকে পলায়নের ফলে কোনোরকমে জীবন রক্ষা হয়। যদিও দ্বিতীয় মহীপাল তথা রামপালের দাদার অত্যাচারী, অতিবিলাসী, শাসনকার্য পরিচালনায় উদাসীন, প্রজাদের প্রতি অনৈতিক পদক্ষেপ এসবের কারণে মনে মনে রামপাল ক্ষুব্ধ ছিলেন। কিন্তু বন্য, অশিক্ষিত, বর্বর, নিম্নশ্রেণির কৈবর্ত সেনানায়ক ভীম কর্তৃক মহীপালের মৃত্যু তিনি মেনে নিতে পারেননি।

'কৈবর্তখণ্ডে' মহাশ্বেতা দেবীর উক্ত উক্তির যথার্থতা অন্বেষণ করতে গেলে ভীমের শাসনকালের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন। 'রামচরিতে'র একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করা হল—

"বিশ্বম্ভরেণ লক্ষ্মীর্লেভেমৃতমলম্ভি সুমনোভিঃ।
কিঞ্চ লভতে স্ম শম্ভু রাজানাং যং সমাসাদ্য।। ২৪।।
অর্থাৎ যাঁহাকে (যে ভীমকে) রাজরূপে পাইয়া সমস্ত জগৎ অত্যধিভাবে সম্পৎ লাভ করিয়াছিল, সজ্জ'নেরা অযাচিত দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পৃথ্বী কল্যাণ লাভ করিয়াছিল।"[১৩]

আবার একই সঙ্গে 'রামচরিতে'র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম শ্লোকটি পাঠ করলে বিপরীত মন্তব্য পাওয়া যায়—

"অথ ধৃত্যমর্ষগর্ব্বোচ্ছলদুৎসাহোয়মুম্মিলৎপুলকঃ।।
রামো মহানুভাবোগি বৈরিবিজয়োদ্যমঞ্চক্রে।। ১।।
অর্থাৎ, অনন্তর মহানুভব বা রাজকীয়-প্রভাব-বিশিষ্ট রাম (রামচন্দ্র ও রামপাল) উন্মিলিত পুলক দ্বারা কণ্টকিতাঙ্গ হইয়াও, ধৈর্য্যে, ক্রোধে বা অসহনশীলতায়, ও গর্ব্বে নিজ উৎসাহ-ভাব উচ্ছলিত বা সংবর্দ্ধিত করিয়া, শত্রুর(রামচন্দ্র পক্ষে রাবনের, রামপালপক্ষে ভীমের) বিজয়ের জন্য উদ্যম করিতেছিলেন।"[১৪]

একই গ্রন্থকারের ভাষ্যকারের মধ্যে এই দোলাচলতা থেকে ভীমকে কিভাবে কালিমালিপ্ত করা যায়? 'রামচরিত' গ্রন্থকারের ভাষ্যকে প্রামাণ্য তথ্য হিসেবে কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু উপন্যাসের বর্ণনা অনুযায়ী এবং পণ্ডিত মহলের গবেষণার ফল স্বরূপ—

"বগুড়া থেকে মহাস্থানগড়ের মাঝামাঝি কন জায়গায় ১৯৪৩ সালে 'ভীমের জাঙ্গাল' নামে একটি চমৎকার ইট বাধানো রাস্তার কিয়দংশ তখনও ছিল।"[১৫]

ক্রমে ক্রমে দিব্যক খনিত দিঘির কথাও জানতে পারা যায়। অনুরূপা দেবীর 'ত্রিবেণী'র তৃতীয় অংশ 'রামপাল', এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আখ্যানভাগে ভীমের সময়কালের এক নতুন গৌড়ের কথা বর্ণিত হয়েছ। বর্ণনা অনুসারে, রাজবিলাস প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। উন্নতি হয়েছিল কৃষির। দ্বিতীয় মহীপালের সময়ে নাগরিক মাত্রেই বিলাসিতায় মশগুল থাকতো। দেশিয় কৃষি ও কুটির শিল্পকে তাচ্ছিল্য করে বিদেশী পণ্য আমদানির মধ্যে দিয়ে মাগধী প্রভৃতিকে ধনশালী করে তুলত। কিন্তু নতুন রাজা ভীম নিজ দেশিয় কুটির শিল্প ও কৃষির প্রতি মনোযোগ দিলেন—

"আজ নগরীর আশেপাশে সকল ক্ষেত্রেই পরিপূর্ণ শস্যভাণ্ডার। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কৃষাণ যুবকের শ্রমোৎফুল্ল সঙ্গীতময় কণ্ঠ, পথে পথে কৃষকবধুর হাসিভরা মুখ। এমনকি, রাজাদেশে কৃষির উন্নতির জন্য স্থানে স্থানে যজ্ঞাদিও সম্পন্ন হইতেছিল। যজ্ঞধুমের মধ্য হইতে ঋত্বিকগণের মুখে মুখে, উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত সুবিশুদ্ধ স্বরে উচ্চারিত হইতেছিল—
"শুনং নঃ কালা বিসৃযন্তঃ ভূমিং—
শুনং কীনাশা অভিযান্ত বাহৈঃ।
শুনং পর্জ্জোন্য মধুনা পরোভিঃ—
শুনাসীরা শুনমম্মাসুধ্যম।"[১৬]

শুধুমাত্র অনুরূপা দেবী নন, তাঁর পরবর্তী কালে পূর্ববঙ্গের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক জাকির তালুকদারের 'পিতৃগণ' উপন্যাসের মধ্যেও ভীম দিব্যককে উদারতার প্রতীক করে দেখানো হয়েছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামপাল যেমন স্বয়ং রামচন্দ্র,

জাকির তালুকদারের রামপাল ঠিক তেমনি বিপরীত। মহীপাল কর্তৃক কারাগারে বন্দী রামপাল কৈবর্ত রক্ষীদের উদারতার সুযোগেই কারামুক্ত তথা কারাগার থেকে পালাতে সক্ষম হয়। যে ভীমকে পাল রজন্যবর্গ ও গৌড়ের তথাকথিত উচ্চবর্গের মানুষসকল পাল রাজমহলকে কলঙ্কিত করছে বলে অভিহিত করেছে, আবার গৌড়ে তথা বরেন্দ্রীতে হত্যাকারীর শাসন চলছে বলে মনে হয়েছে তাদের, সেইসঙ্গে বর্বর ও অশিক্ষিত বলে ভীমের প্রতি আন্তরিক ক্ষোভ রেখে কেউ বরেন্দ্রি ছেড়েছে, কেউবা অভিশপ্ত জীবনযাপনের মতো করে নিজেদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে বলে মনে করেছে, সেই ভীমই বরেন্দ্রিবাসী ও গৌড়ের সমস্ত প্রজাবর্গকে সমান চোখে দেখে তাদের সকলের সুরক্ষার জন্য নির্মাণ করলেন 'জাঙ্গাল', কারণ বৈদেশিক আক্রমণ রুখতে পারলে শুধুমাত্র কৈবর্ত প্রজারা সুরক্ষা পাবে না, পাবে সমগ্র বরেন্দ্রিবাসী। একসময়ে কৈবর্তদের প্রতি দুর্ব্যবহারে প্রবৃত্ত উচ্চবিত্ত শ্রেণি, ধনী মহাজন ও বণিকদের প্রতিও ভীমের দুরাচারের নিদর্শন কোথাও পাওয়া যায় না। এখন প্রশ্ন জাগে, ভীমের কলঙ্ক তাহলে কোথায়? কেন তাকে রাজা হিসাবে মেনে নিতে বরেন্দ্রিবাসীর সমস্যা হচ্ছিল। 'পিতৃগণ' উপন্যাসে ভীম-রামপালের বাকযুদ্ধের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক বিষয়টি পরিস্কার করে দিয়েছেন—

> "বিনা রক্তপাতে তুমি যদি বরেন্দ্রী আমার হাতে প্রত্যর্পন করো, তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো।"[১৭]

এছাড়া সামন্ত রাজ্য দান, সহযোগীদের অপরাধ ক্ষমা, তাদের যথোচিত পদাধিকার দান, ভীমকে স্বর্ণ-রৌপ্য-প্রাসাদ-সুন্দরী রমনী ইত্যাদি দানের বিনিময়ে—

> "আমি (রামপাল) শুধু চাই, আর্য ভূখণ্ড আর্য অধিকারে ফিরে আসুক।"[১৮]

আর্যাবর্তের আর্যদের এই দাবী('বরেন্দ্রি আর্য ভূখণ্ড') সমগ্র কৈবর্ত জাতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের নেতৃত্বকারী ভীমের মতো দেশপ্রেমিকের কাছে হাস্যকর বলে মনে হয়েছে। পরিণতি স্বরূপ দেখা যায়— মগধের ভীমযশা, কোটাটবীর বীরগুণ, দণ্ডভুক্তির জয়সিংহ, অপরমন্দারের লক্ষ্মীশূর, কুজবটীর শূরপাল এবং নিদ্রাবলীর বিজয়রাজের সঙ্গে রামপালের তথা কলিঙ্গের সেনার বিপুল বাহিনীর সঙ্গে ভীমবাহিনীর যুদ্ধ। অন্যায় যুদ্ধে ভীম বন্দী এবং তার সম্মুখেই তাঁর পরিবারের শিরশ্ছেদ ও অবশেষে তার শিরশ্ছেদ।

কাহিনী ও ইতিহাসের স্বল্প সূত্র থেকে এটুকু স্পষ্টীকৃত করে বলা যায়, শেষ কৈবর্ত রাজা ভীমের সম্পর্কে কলঙ্ক শব্দটা ব্যাবহারের মধ্যে দিয়ে মহাশ্বেতা দেবী পাল আমলের ও রাজ্যের তথাকথিত উচ্চবর্গ শ্রেণির প্রতি তাঁর ঘৃণাত্মক মনোভাবই পোষণ করেছেন। কিন্তু অনুরূপা দেবী অন্য চিত্র আঁকলেন। অনুরূপা দেবীর উপন্যাসে কৈবর্তদের ক্ষোভ ও তার পরিণামে অপ্রস্তুত গৌড়ে হানার যথার্থ কারণ দেখিয়েছেন, কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি উভয় শক্তি তথা পালশক্তি ও কৈবর্তশক্তির মধ্যে কোথায় যেন একটা মধ্যস্ততা করাতে চেয়েছেন। এই সমতা দেখাতে গিয়ে যদিও তিনি কোনো একটা শক্তিকে মহান করে দেখিয়ে আরেকটাকে ক্ষুদ্র করেছেন তা নয়। কখনো ভীমকে মহান করেছেন, কখনো বা রামপালকে। দিব্যকের ক্ষোভ, বুদ্ধিমত্তা, চতুরতাকে তিনি ছোটো ও স্বার্থলোভী ও সাম্রাজ্যবাদী নীতির চোখে দেখেননি। দিব্যকের ভূমিকা এখানে বাহুবলী তথা শক্তিসামর্থ্য যোদ্ধা হিসাবে নয়, এখানে সে তাঁর রননিপুণ ভাইপো ভীমের পরিচালক।

ঔপন্যাসিক দিব্যককে সত্তর বছরের বৃদ্ধ করে গড়ে তুললেও, তার মধ্যে যথার্থ বুদ্ধিমত্তার ছাপ দিতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। পুত্রবধুর অপহরণকারী যে রাজানুগ্রাহী কোনো ব্যক্তি অথবা রাজা স্বয়ং, সে বিষয়ে দিব্যক নিজের অনুমান সম্পর্কে স্থিরচিত্ত। কিন্তু তার স্থির ও অচঞ্চল এবং স্থৈর্যবান মস্তিষ্ক তাকে রাজার সঙ্গে প্রথমেই উগ্রমস্তিষ্কে উচ্চবাচ্য প্রয়োগের মাধ্যমে বাক্যালাপ করতে দেয়নি। বরং একজন রাজভৃত্তের মতোই নত মস্তিষ্কে ও নম্র ব্যবহারে রাজাকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে কার্যসমাধার জন্য পরিবারের অবস্থা ও ভীমের দুরবস্থার কথা জানিয়ে অশ্রুবিয়োজন পর্যন্ত করেছে। কিন্তু মহীপালের কটুবাক্য প্রয়োগে বৃদ্ধ দিব্যকের কণ্ঠে তারুণ্যের ছন্দ ধ্বনিত হয়। উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদে এর বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় দিব্যকের ভাবনা বা স্বগতোক্তির মধ্যে দিয়ে–

> "আত্মপরায়নের রাজা হওয়া সাজে না। যে রাজা প্রজার জন্য নিজেকে বঞ্চিত করিতে পারে না, নিজের শান্তি, নিজের স্বার্থ খুঁজিয়া বেড়ায়, সে রাজবেশী প্রজাশত্রু, —প্রজা তাকে রাজপূজা দিতে বাধ্য নয়! একদিন তোমার পূর্বপুরুষ গোপালদেবকে এই প্রজারাই তাঁদের রাজা ব'লে বেছে নিয়েছিল, আর আজ তারাই আবার ছেঁড়া কাপড়ের

> মত তমায় তাঁদের গা থেকে টেনে নিয়ে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।–পারবেনা? নিশ্চয়ই পারবে। যারা গড়তে জানে, তারা ভাঙ্গতেও পারে।"[১৯]

একবার দিব্যককে মধ্যস্থতাকারী করে আঁকলেন, একবার প্রবল রণসংগ্রামের তুর্যধ্বনিকারক করে দেখালেন। ঘটনা ভিন্ন হলেও পাল রাজন্যবর্গের তথা দ্বিতীয় মহীপালের রক্তপিপাসু ভীম কর্তৃক মহীপাল হত্যার পর রামপাল পত্নী সন্ধ্যারানী, রাজমহিষী সহ অন্তপুরের নারীদের পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার মধ্যেও প্রতিশোধ স্পৃহা উপযুক্ত স্থানে প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পরিস্ফুট হয়। কারণ ভীমের প্রতিশোধ দ্বিতীয় মহীপাল ও তাঁর সহচরবর্গদের সঙ্গে সঙ্গে পাল রাজধানী গৌড়ের তথাকথিত উচ্চবর্গদের প্রতি। তার মানবিকতা ও মনুষ্যত্ববোধ নারী হত্যা ও ধর্ষণে ঘোর বিরোধিতা করে নিজেরই পক্ষের কৈবর্ত সেনাদের ওই বিষয়ে অন্যায় ও অত্যাচার করতে দেয়নি।

আবার উপন্যাসে শেষাংশে যুদ্ধে পরাজিত ও দৃত ভীমের মৃত্যুদণ্ড শাস্তির ঘোষক রামপালের মধ্যেও মানবিকতা প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে কৈবর্ত ও পাল শক্তির মধ্যে একটা মধ্যস্থতা স্থাপনের ইঙ্গিত মেলে। ধৃত ভীমের বিচার সভায় বরেন্দ্রির তথা বরেন্দ্রির সকল স্তরের প্রজাদের উন্নতির জন্য ভীমের উদ্যোগ ও কার্যকলাপ এবং বিদেশী আক্রমণ প্রধিরোধের জন্য ব্যবস্থাপনা ও সৈন্যসমাবেশের বিপুলতা ইত্যাদিকে সামনে রেখেও রামপালকে তার অনিচ্ছায় ভীমের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করতে হয়। কারণ, রাজপুরুষ ও উচ্চবর্গদের মানহানি রুখতে রাজা রামপালের তরফ থেকে এই কর্তব্য পালন করতেই হতো। কিন্তু শাস্তির আগের রাত্রে ছদ্মবেশে ভীমকে কারামুক্ত করে ভীনরাজ্যে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়ার মধ্যে দিয়ে রামপালের মানবিকতার ছবিটি আঁকা হয়ে যায়। উপন্যাসে বর্ণিত রামপাল ও ভীমের শেষ কথোপকথনের কিঞ্চিদাংশ উদ্ধৃত করা হল। রামপাল ভীমের উদ্দেশ্যে বলছেন—

> "আমি বিদ্রোহীর শাস্তিবিধান করেছি, কিন্তু যে রাজা এত অল্পদিনে এমন প্রজারঞ্জক হ'তে পেরেছিল তার অমূল্য জীবন নষ্ট করবার অধিকার আমার নেই; কে ব'লতে পারে? আমি নিজে হয়ত তোমার মত প্রজাপালক হ'তে পেরে উঠবো না।"[২০]

সহৃদয় ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের নমুনা ভীমের বক্তব্য থেকেও পরিস্কার হয়ে যায়।–

> "আমি প্রজাদের পক্ষ থেকে তাদের রাজ নির্বাচন কায়মনোবাক্যে ক'রে দিলুম তুমিই বরেন্দ্রীর উপযুক্ত রাজাধিরাজ।"[২১]

কৈবর্ত বিদ্রোহের ইতিহাস পর্যালোচনা থেকে শুরু করে অধিকাংশ উপন্যাসেই ভীম ও তার পরিবারের প্রতি রামপালের নিষ্ঠুরতার ছবি দেখানো হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের শেষে দুই শত্রু পক্ষের রাজার মধ্যে অনুরূপা দেবী আঁকলেন সখ্যতা ও মেলবন্ধনের তথা শান্তির পটভূমি।

তথ্যসূত্র :

১. অনুরুপা দেবী, ত্রিবেণী, কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, 'ভুমিকাংশ'
২. তদেব
৩. ঐ
৪. [bn.wikisource.org/wiki/পাতা, বঙ্গদর্শন-চতুর্থ খণ্ড. বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত, পৃ. ১৭৪
৫. অনুরুপা দেবী, ত্রিবেণী, কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, পৃ. ১৮০
৬. তদেব, পৃ. ৩১ - ৩২
৭. রবীন্দ্র রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৩৯৪, কলকাতা ১৭, পৃ. ৪৬৭
৮. অনুরুপা দেবী, ত্রিবেণী, কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, পৃ. ৩৩৮
৯. তদেব, পৃ. ৩৩৯
১০. ঐ, পৃ. ৩৩৯
১১. ঐ, পৃ. ৩৪৩

১২. মহাশ্বেতা দেবী, কৈবর্ত খণ্ড, মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, একবিংশ খণ্ড, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪, পৃ. ৩১৭
১৩. ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক, গৌড়কবি-সন্ধ্যাকরনন্দি-বিরচিত রামচরিত (বাঙ্গালা সংস্করণ), জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, ভাদ্র, ১৩৬০, পৃ. ৫৪
১৪. তদেব, পৃ. ৩৮ - ৩৯
১৫. মহাশ্বেতা দেবী। কৈবর্ত খণ্ড, মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, একবিংশ খণ্ড, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪, পৃ. ২৭৯
১৬. অনুরুপা দেবী, ত্রিবেণী, কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, পৃ. ৪৫২
১৭. জাকির তালুকদার, পিতৃগণ, ঢাকা, রোদেলা প্রকাশনী, একুশে বইমেলা, ২০১১, পৃ. ২৭৭
১৮. তদেব, পৃ. ২৭৭
১৯. অনুরুপা দেবী, ত্রিবেণী, কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, পৃ. ৩৫৭
২০. তদেব, পৃ. ৫২১
২১. ঐ, পৃ. ৫২১